মিস্ট্রী গার্ল

স্বপন কুমার

সি. আই. ডি. সিরিজ—৫নং

মিস্‌ট্রি গার্ল

শ্রীস্বপনকুমার

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

চতুর্থ প্রকাশ]

মূল্য ঃ তিন টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ
"রাজেন্দ্র লাইব্রেরী"
১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
"মা তারা প্রিন্টিং প্রেস"
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

বাংলা-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক,

রহস্য ও রোমাঞ্চ-সাহিত্যের যাদুকর

শ্রীস্বপনকুমার রচিত

সি. আই. ডি. সিরিজ

১। ছত্রপতির তলোয়ার
২। অপরাধী সম্রাট
৩। দস্যুরাজের ষড়যন্ত্র
৪। প্রাণ নিয়ে খেলা
৫। মিস্ট্রি গার্ল
৬। আঁধার রাতের যাত্রী
৭। গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব
৮। হীরার লকেটের রহস্য
৯। অজানা পার্শ্বেলের রহস্য
১০। নীল সাগরের আতংক

[এর পরে আরও বের হচ্ছে]

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

॥ এক ॥

শোঁ শোঁ—

বয়ে যাচ্ছে মাতাল বাতাস উদ্ধত দামাল শিশুর মত দুরন্তপনা নিয়ে।

আকাশে ঘন কালো মেঘের ছায়া। সে মেঘের ছায়ায় সন্ধ্যা হতে না হতেই আঁধার ঘনিয়ে আসে।

শহরতলী।

শহরের গায়ের নোংরা আবর্জনার স্তূপ যেন এখানে এসে জমেছে।

মাঝে মাঝে বড় বড় বাড়ি—আবার মাঝে মাঝে নোংরা বস্তি।

এই শহরতলীর পথ সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্জন হয়ে এসেছে।

পথে দু'একজন লোক মাঝে মাঝে বের হয় নেহাৎ কোন কাজ থাকলে।

এই জনহীন পথ চলে গেছে গঙ্গার ধার দিয়ে।

সন্ধ্যার আঁধার নামল।

গঙ্গার ঘাটে এই সময়েই একটা নৌকা ধীরে ধীরে এসে থামল।

নৌকা থেকে নামল একজন লোক।

এই জনহীন পথে কেউ নেই। নৌকাটাতেও কোনও আলো জ্বলছে না।

লোকটা নেমেই পথ ধরে এগিয়ে চলল। কিছুটা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

এমন সময়—

শোনা গেল একটা শিসের শব্দ।

লোকটা তৈরী হয়েই ছিল। সেও পালটা তেমনি শব্দ করল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একজন লোক।

—কে ?

—আমি দশ নম্বর।

—ঠিক আছে। সংকেত বল।

—সাদা গোলাপ।

—আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।

দুজনে এগিয়ে চলল পথটা ধরে। অনেকক্ষণ চলে তারা এলো একটা ভাঙা বাড়ির সামনে।

সেখানে আসতেই তিন চারজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো তাদের।

—তোমরা ?

—হ্যাঁ, সাদা গোলাপ।

—ঠিক আছে, ভেতরে চলো।

ভেতরে ঢুকল তারা। সেখানে গিয়ে তারা চলল একটা আধো অন্ধকার ঘরে।

নিশ্ছিদ্র আঁধার। কোণে একটা মিট্‌মিটে আলো জ্বলছে।

ভেতরে এক কোণে তিনজন লোক তাসের জুয়া খেলছিল।

তারা এবার খেলা বন্ধ করল।

সকলে গোল হয়ে বসল এবার সেই আলোর চারপাশে।

দেখা গেল, সংখ্যায় তারা দশজন।

তারা নানা জায়গা থেকে এসেছে। তাই কেউ কাউকেই চেনে না।

অবশ্য তারা এসেছে একই লোকের আমন্ত্রণে। তবে সেই আমন্ত্রণ-কারীকে তারা শ্রদ্ধা করলেও তার চেহারা কেউ দেখেনি।

একটু পরে।

সকলে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল এই সময়টির জন্যেই।

শোনা গেল মৃদু শব্দ—

ঢং ঢং···

ঘণ্টা বাজছে।

এবার সকলে চুপ—ঘরে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না।

একজন বললে—এসে গেছেন? খুব ধীরে ধীরে বলল কথাটা।

—হ্যাঁ।

তারপরেই ঘরের মধ্যে ঢুকল একটি মূর্তি। তার দেহ আপাদমস্তক একটা আবরণে ঢাকা।

মূর্তিটি ঢুকেই একজনকে প্রশ্ন করল—সকলে এসে গেছে?

—হ্যাঁ।

—বেশ, শুরু হোক।

একটু থেমে মূর্তিটি আবার কথা বলতে শুরু করল। তবে সে কণ্ঠের স্বর মেয়েলী ধরনের। তাহলেও তার স্বরে ছিল একটা প্রভুত্বের সুর।

মূর্তিটি বললে—এই যে দেখছ লোকটি—এর নাম সুদর্শন। এ হলো আমার ডানহাত। তোমরা সকলে এর আদেশ ঠিক দেবতার আদেশের মতই মেনে চলবে।

—আচ্ছা। সকলে একবাক্যে বলল।

—তোমাদের যার উপরে যে কাজের ভার দেব, তা সঙ্গে সঙ্গে করবে। প্রতিটি কাজের জন্যে উপযুক্ত টাকা পাবে। তবে একটা কথা—আমার আদেশ না পেলে কোনও কাজ করবে না।

একটু থেমে মূর্তিটি বললে—তোমরা সুদর্শন মারফৎ বা চিঠির মাধ্যমে আমার হুকুম ঠিক সময়ে পাবে। আমি প্রচলিত এই সব আইন-কানুন, ধর্ম-অধর্ম মানি না। আমি চাই কাজ—চাই টাকা। পরিবর্তে টাকা দিতেও কার্পণ্য করি না।

এখন প্রথমে যে কাজটির ভার দেব তোমাদের, তা ভাল করে শোন।

দক্ষিণ কোলকাতার বিখ্যাত ধনী রামরতন শেঠ হলো আমার এবারের প্রথম শিকার। দীর্ঘদিন পরে বাংলায় এসে প্রথম কাজে হাত দিচ্ছি আমি।

রামরতন শেঠ ধনী—কিন্তু অন্যায়কারী, অত্যাচারী। তাই তার কাছ থেকে আমরা বিশ হাজার টাকা চাই। যদি সে টাকা না দেয়, তাহলে কিভাবে তা আদায় করতে হবে, তাও জানি।

আমার প্ল্যান তোমাদের বলছি। সেই অনুযায়ী কাজ করবে। যদি সফল হও—মোট টাকার চার আনা আমি নেবো, বাকি বারো আনা আমি তোমাদের সমভাবে ভাগ করে দেবো।

এবার শোনো আমার পরিকল্পনা।

তারপর সেই নারীকণ্ঠ ধীরে ধীরে ভয়াবহ সব পরিকল্পনার কথা বলে চলল।

কিন্তু এসব বলতে তার স্বর একটুও কাঁপল না, এমনি নিষ্ঠুর সে।

সবাই তার কথা শুনতে লাগল।

কথা শেষ করে নারীকণ্ঠ বললে—আর একটা কথা শোন তোমরা।

—বলুন।

—আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলেই তা আমি জানতে পারব। তার ফল হবে ভয়াবহ—মৃত্যু। কথাটা মনে রেখো।

—আচ্ছা।

—আর আমার পরিচয় জানবার চেষ্টা কেউ ক'রো না। তা পারবে না—বরং তার ফলে নিজেদেরই জীবন বিপন্ন করবে তোমরা।

নারীকণ্ঠ চুপ করল।

—একটু বাদে বললে—আচ্ছা চলি।

নিমেষে প্রস্থান করল সেই মূর্তি।

ওরা সব বসে রইল ঠিক যেন পাথরের এক একটি মূর্তির মতো।

॥ দুই ॥

দক্ষিণ কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে রামরতন শেঠকে সবাই চেনে বিখ্যাত ধনী হিসাবে।

রামরতন শেঠ যে সৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করেন নি তা অনেকেই জানে।

তাঁর বিরাট দোকান বড়বাজার অঞ্চলে। সেই দোকান থেকে ভেজাল নানা জিনিস ও বেআইনী মালপত্র বেচাকেনা করেই তাঁর এই অর্থ উপার্জন।

তবু ধনী হিসাবে সকলে তাঁকে সম্মান করে। তিনি একজন গণ্যমান্য লোক হিসাবে বিখ্যাত।

সেদিন সকালবেলা।

রামরতন তাঁর ঘরে বসে সকালের খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় ভাই বৈদ্যনাথ একতাড়া চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল। সব ক'টা চিঠিই এসেছে সেদিনের ডাকে।

রামরতন প্রতিটি চিঠি মন দিয়ে পড়তে লাগলেন একে একে।

সব ব্যবসার চিঠি।

হঠাৎ একটা চিঠি একটু অন্যরকম মনে হলো! সেটা তিনি উল্টেপাল্টে দেখলেন।

তারপর খ'ম খুলে পড়লেন চিঠিটা।

তাতে লেখা :

প্রিয় রামরতন শেঠ,

সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করে তোমার প্রচুর অর্থের জন্যে। কিন্তু আমি তা করি না।

তার কারণও আছে।

কিভাবে তুমি যে এই অর্থ উপার্জন করেছ তা আমার অজানা নেই। আমি তোমার এই অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থের সামান্য একটা অংশ দাবি করছি। বিশ হাজার টাকা তুমি আমাদের দেবে সৎকাজে ব্যয় করার জন্য। আর তা না দিলে, আমরাই টাকাটা আদায় করে নেব। তখন তোমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে, মনে রেখো।

এর কোনও ব্যতিক্রম হবে না—হতে পারে না।

যা হোক, আমার দাবি পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলে তুমি আজই বিকেলে ঠিক পাঁচটায় ঐ টাকা নিয়ে কার্জন পার্কে আসবে।

আর যদি তা না আস, আগামী পরশু রাত দশটার মধ্যে আমি তোমার বাড়ি থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নেবো। তুমিই আমার এ যাত্রার প্রথম শিকার।

তুমি যে বেআইনী উপায়ে অর্জিত টাকার অর্ধেকের বেশি বাড়িতেই রাখ, তা আমি জানি। তাই কোন অসুবিধা হবে না।

আশা করি, এ চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পারবে। ইতি—

মিস্‌ট্রি গার্ল।

চিঠিটা পেয়ে রামরতন শেঠ বিস্মিত।

একি প্রহেলিকা ?

কে এ চিঠি লিখেছে ?

চিঠির হস্তাক্ষর মেয়েলী। কোনও মেয়ের লেখা চিঠি এটা।

রামরতন হাসলেন।

নিশ্চয় কেউ মিথ্যা তাঁকে ভয় দেখিয়েছে!

তবু রামরতন তাঁর ভাইকে চিঠিটা দেখালেন।

বৈদ্যনাথ হেসে উড়িয়ে দিল।

* * *

রামরতনের দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষে বিয়ে করেছিলেন কুড়ি বছর বয়সে—মেয়েটির নাম শান্তি! তারপর ধনী হবার পর মাত্র দু'বছর হলো একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেন ক্লাবে প্রেম করে। সেই আপ-টু-ডেট স্ত্রীর নাম ললিতা।

স্ত্রীদের তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজেও যান নাইট ক্লাবে। এছাড়া তাঁর ভাই-এর এক স্ত্রী ও এক কন্যা। স্ত্রীর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—মেয়ের বয়স আঠারো।

বৈদ্যনাথের স্ত্রী সুশীলা ও কন্যা লতা কিন্তু পছন্দ করে না রামরতনের অন্যায় ব্যবসা! তবু তারা বাধ্য হয়েই এ সংসারে থাকে—কারণ, বৈদ্যনাথের পৃথক উপার্জনের ক্ষমতা নেই।

রামরতনের নিজের ছেলেমেয়ে নেই। আছে এক ভাগ্নে জীবন ও ভাগ্নী বিনতা। এই নিয়েই তাঁর সংসার।

রামরতন চিঠিটা পেয়ে ভাই ছাড়া আর কাউকে কিছু বললেন না।

ভাই বললে—চিঠিটার কথা থানায় জানানো উচিত।

—তা বটে।

—তাহলে জানান একথা—কারণ, এ ব্যাপার ত ভাল নয়।

রামরতন তক্ষুণি থানায় গেলেন।

* * *

ভবানীপুর থানা।

ও. সি. মিঃ বরাট চিঠিটা পড়লেন। হেসে বললেন—ঠিক আছে। ভয় নেই। আমি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

—ঠিক আছে।

—আর, একথা কাউকে বলবেন না যেন।

—না।

মিঃ বরাট একটা জেনারেল ডায়েরী লিখে রেখে বিদায় দিলেন রামরতনকে।

* * *

রামরতন বাড়ি ফিরলেন।

তবু তাঁকে বেশ চিন্তিত মনে হলো।

বাড়ি ফিরে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। এমন সময় টেলিফোনটা ঘন ঘন বেজে উঠল।

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

—হ্যালো, কে?

—আমি। বললে একটি নারীকণ্ঠ।

—কে তুমি?

—আমি রহস্যময়ী—মিস্ট্রি গার্ল, এই আমার পরিচয়।

—কি চাও তুমি?

—তুমি থানায় গেছিলে?

—কে বললে?

—আমি জানি। আমার নজর সব সময় সব দিকে থাকে। তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছ! আমার চিঠি পেয়ে থানায় গেছ।

—তুমিই চিঠি দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কি চাও তুমি?

—বিশ হাজার টাকা।

—বিশ হাজার টাকা অত সস্তা নয়।

—জানি—কিন্তু তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা দেবার জন্যে তৈরী থাক। টাকা আমাদের চাই-ই।

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

রামরতন অমনি এক্সচেঞ্জকে প্রশ্ন করলেন—এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিল কে?

এক্সচেঞ্জ জানাল—পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করা হয়েছিল স্যার।

—ও।

রামরতন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তাঁর দুটি চোখে যেন অন্ধকার নেমে এলো।

॥ তিন ॥

পরদিন রামরতন আবার থানায় গেলেন। তিনি সেখানে জানালেন সেই রহস্যময় ফোনের কথা।

অফিসার মিঃ বরাট বললেন—কোনও ভয় নেই আপনার। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়ে থাকে—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

—তা বটে।

—কোনও ভয় নেই আপনার।

—আচ্ছা, একট কথা—

—বলুন।

—কাল আপনারা আমার বাড়িতে কিছুটা পাহারার ব্যবস্থা করবেন তো স্যার?

—করব।

—আর দীপক চ্যাটার্জী আমার পরিচিত। যদি বলেন ত তাঁর সাহায্য নিতে পারি। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার বাড়িতে আনিয়ে সব কথা তাঁকে খুলে বলব।

—তাতে কি লাভ হবে?

—হবে।

—কি রকম?

—তিনি থাকলে দস্যুরা আসতে সাহস পাবে না।

—বেশ, তবে তাই করুন।

রামরতন তক্ষুণি দীপককে ফোন করলেন।

দীপক সব শুনে বললে—আচ্ছা, আপনি কি জানেন কে এই মিস্‌ট্রি গার্ল ?

—না।

—সন্দেহ করেন কাউকে ?

—না, তাও না। সে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

দীপক চিন্তা করতে থাকে।

এখন সে কি করবে ? কোন্ পথ ধরে সে চলবে ? তাই সে বললে —পুলিস পাহারা বসবে ত বাড়িতে ?

—হ্যাঁ।

—তবে ভয় নেই ততটা। আমি কিন্তু পুলিসের সঙ্গে থাকব না।

—পৃথক থাকবেন ? একথা কেন ?

—কারণ আছে। আমার সাহায্য ঠিক জায়গা থেকে পাবেন না, যদি না আমি পৃথকভাবে থাকি।

—বেশ, তবে তাই হবে।

॥ চার ॥

নির্দিষ্ট দিনে।

দলে দলে পুলিস এসে ঘিরে ফেলে রামরতন শেঠের বাড়ি।

তাদের প্রত্যেকের প্রতি নির্দেশ থাকে, যেন কোনও ভাবে তারা কাজে গাফিলতি না দেখায়।

ও. সি. মিঃ বরাটও মাঝে মাঝে এসে তদারক করে যান পুলিসদের।

কিন্তু কোনও অঘটন ঘটে না।

মিঃ বরাট নিশ্চিন্ত হন—না, ভয়ের কিছু নেই। এই দুর্ভেদ্য পুলিসব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না কেউ।

রাত সাড়ে নটা।

আবার আসেন ভেতরে। পুলিসদের বলেন—তোমরা সাবধানে থেকো।

তারা পথ ছেড়ে দেয়।

মিঃ শেঠের ঘরে প্রবেশ করেন মিঃ বরাট।

তিনি বলেন—আসুন।

মিঃ বরাট দরজা বন্ধ করেন। তারপর একটা পিস্তল উদ্যত করে বলেন—সিন্দুকের চাবি দাও, না হলে গুলি করব।

এবারে মিঃ শেঠ লক্ষ্য করেন যে কণ্ঠস্বরটি মেয়েলী।

তিনি বিস্মিত হন।—কে তুমি?

—আমিই মিসট্রি গার্ল। আমার দলবল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শীগ্‌গীর চাবি দাও।

তিনি সভয়ে চাবিটা দিয়ে দেন।

মিসট্রি গার্ল তাঁর নাকে কি শুঁকিয়ে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলে।

তারপর সিন্দুক খুলে চল্লিশ হাজার টাকা গুনে নিয়ে চলে যায়।

পুলিসরা কিছুই বুঝতে পারল না।

* * *

ঘণ্টা দুই পরে মিঃ শেঠের জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি চীৎকার করে ওঠেন।

সকলে ছুটে আসে।—কি হলো?

—মিঃ বরাটের ছদ্মবেশে দস্যু টাকা নিয়ে পালাল তোমরা কি করছিলে?

—সে কি স্যার?

—ঠিকই বলছি। শীগ্‌গীর থানায় ফোন করো।

* * *

মিঃ বরাটের বাড়ির অদূরে যে পাগলটা বসেছিল সে-ই দীপক চ্যাটার্জী।

সে দেখল যে একটা গাড়ি দ্রুত ছুটে চলল। তখন সে আন্দাজ করল ব্যাপারটা।

অদূরে দাঁড়ান একটা গাড়িতে উঠে সে অনুসরণ করল ওদের।

দ্রুত ছুটে চলল দুটি গাড়ি কোলকাতা মহানগরীর বুকের ওপর দিয়ে।

গাড়ি ছুটল উত্তরদিকে।

শ্যামবাজার।

এমন সময় একটা হাতবোমা এসে ছিটকে পড়ল দীপকের গাড়ির উপরে। দীপক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তার গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পথে পড়ে রয়েছে একটা কাগজ। তাতে লেখা: আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিসট্রি গার্ল। আমার অনুসরণ বৃথা।

॥ পাঁচ ॥

দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও মিস্‌ট্রি গার্লকে ধরা গেল না বা তার পরিচয় জানা গেল না।

দীপক চ্যাটার্জীর মত গোয়েন্দাও ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

সেদিন সকালবেলা।

দীপক কতকগুলো পুরানো কেসের ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করে চলেছিল।

সেগুলো দেখা শেষ করে সে খবরের কাগজে মন দিল।

হঠাৎ একটা খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুন্দরবন অঞ্চলের একটা গ্রামে হরিপদ রায় নামে এক ধনী ভদ্র-লোককে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ঘরের ভেতর লোহার সিন্দুকে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ও আশী ভরি সোনা ছিল।

সকালবেলা মৃত হরিপদবাবুর ঘরে সিন্দুকটি ভাঙা অবস্থায় দেখা গেছে—টাকা ও সোনা অপহৃত হয়েছে।

দুষ্কৃতকারী এখনও ধরা পড়েনি।

খবরটা পড়েই দীপক রতনকে ডাক দিল—রতন!

দীপকের সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল ঘরের মধ্যে এসে বললে—কি ব্যাপার রে?

—ব্যাপার তেমন কিছু নয়—এই খবরটা পড়েছিস?

রতন সেটা পড়ে কাগজটা দীপককে ফেরৎ দিতে দিতে বললে—বাব্বা! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি!

—হ্যাঁ।

—আমার সন্দেহ হয় এ মিস্ট্রি গার্লের দলের কাজ।

দীপক হাসে। বলে—আমারও তাই মনে হয়।

—তবে ত মিলে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, গ্রেট ম্যান থিংকস্ অ্যালাইক। যাক, মিস্ট্রি গার্ল তাহলে এই কোলকাতা শহর ছাড়লেও বাংলাদেশ ছাড়েনি।

—তা ত বোঝাই যাচ্ছে।

—একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান কর্তা—চাকর ভজুয়া বলল।

—লোক?

—হ্যাঁ। মানে, ভদ্রলোক।

—কোথায়?

—বাইরের ঘরে।

—ভেতরে নিয়ে আয়।

ঘরে একটু পরেই প্রবেশ করেন মাঝারি দোহারা চেহারার একজন ভদ্রলোক। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। হিটলারী গোঁপ। পরনে ধুতি আর হাফসার্ট। পায়ে নিউকাট জুতা।

—নমস্কার দীপকবাবু!

—নমস্কার! কোত্থেকে আসছেন?

—শ্যামবাজার স্ট্রীটে আমার বাড়ি। আমার নাম ধীরেন্দ্র রায়-চৌধুরী। কয়েকটা বিষয়ে আপনার সাহায্য পাবার আশায় এসেছি।

—নিশ্চয়ই। যদি আইনবিরুদ্ধ না হয়, তবে সাহায্য নিশ্চয়ই পাবেন।

—না, আইনের বিপক্ষে নয়। আমার ভাই শ্রীমান বিকাশ কিছুদিন

ধরে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে বিনা কারণে চম্‌কে ওঠে। একটা ভয়-ভয় ভাব। অথচ আগে সে এ ধরনের ছিল না। বরং সে ছিল চটপটে। কিসের একটা ভয়ে এই ভাবান্তর ঘটেছে বলেই মনে হয়। কিছু প্রশ্ন করলে সে কোনও উত্তর দেয় না।

—আচ্ছা গোটা কয়েক প্রশ্ন করব আপনাকে ?

—করতে পারেন।

—আপনার পেশা ?

—আমরা তিন পুরুষ ধরে জমিদার। জমিদারি, বাড়ি—এসব আছে।

—আপনারা দু-ভাই ছাড়া পরিবারে আর কে কে আছেন ?

—আমার স্ত্রী, এক ছেলে। আপন ভাই বলতে বিকাশ। এছাড়া মামাতো দু'ভাই আছে। তারা আশ্রিত।

—তাদের নাম ?

—গৌর আর নিতাই। এছাড়া এক কাকাও আছেন, তবে তিনি পৃথকান্ন।

—তিনি কি করেন ?

—আমার বাবা বেঁচে থাকতেই কাকা বিষয় ভাগ করে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িও পৃথক।

—আপনাদের বাড়ি থেকে কতদূর ?

—পাশাপাশি—একই বাড়ি, মাঝখান থেকে দুটো পৃথক ভাগ করা।

—আচ্ছা, বিকাশবাবুর এই ভয় সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না বলেই ত—

—অনেক সময় ভয় খেয়ে পাগলামির একটি লক্ষণ জাগে। বিভিন্ন ধরনের ভয় থাকে। আবার অনেক সময় এটা সাময়িকও হতে পারে।

—কিন্তু এক্ষেত্রে আমার তা মনে হয় না। বিকাশ গতবার টেস্টে কলেজের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিল। পড়াশুনাতে সে বরাবরই ভাল—তার প্রতিভাও আছে। তাছাড়া তেমন কোনও লক্ষণ আগে দেখা যায়নি।

—কিন্তু আপনার কাছে কি কোন কথাই প্রকাশ করে বলেনি সে?

—না, একেবারেই না। এ সম্বন্ধে কথা হলেই সে কেমন যেন এড়িয়ে যায়।

দীপক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রের মধ্যে নিক্ষেপ করল। তারপর আপন মনে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। শিকারী কুকুর সহসা শিকারের গন্ধ পেয়েছে যেন।

জানালা দিয়ে তাকাল নীচের দিকে।

একতলায় একজন অজানা লোক দাঁড়িয়ে। অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। হালকা অন্ধকারে লোকটির সারা দেহ আচ্ছন্ন, কেমন যেন রহস্যাবৃত।

দীপক জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি সরে যায় শাঁ করে। যেন আঁধারের বুকে মিলিয়ে যায় কোন একটা রহস্যময় অশরীরী।

গুড়ুম—গুড়ুম—

পর-পর দুটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় জানালার চৌকাঠে।

কে এভাবে গুলি ছুঁড়ল?

দীপক ছুটে গেল ড্রয়ারের কাছে। রিভলভারটা নিয়ে দোতালা থেকে তর-তর করে নেমে এল একতলায়।

কিন্তু একি?

একতলায় কোন লোকের অস্তিত্বও নেই।

কে তবে এই রহস্যময় আততায়ী? ইচ্ছা করলে সহজেই সে দীপককে হত্যা করতে পারত। কিন্তু তা না করে ওকে শুধুমাত্র ভয় দেখাল কেন?

বাইরের নরম মাটিতে শুধু গোটাকয়েক খুরওয়ালা জুতোর চিহ্ন, এছাড়া আর কোন প্রমাণই ফেলে যায়নি এই নৈশ-অতিথি।

না, ওই ত আর একটা চিহ্ন।

দীপক এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো সেটা। মোড়ক-করা একটুকরো কাগজ।

একটা চিঠি। তাতে লেখা :

গোয়েন্দাপ্রবর,

জমিদার ধীরেন্দ্র রায়চৌধুরীর ঘটনাটি থেকে সব সময়ে দূরে থাকবেন। তা না হলে যে-কোনও মুহূর্তে আপনার বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

ইতি—

মিস্‌ট্রি গার্ল

দ্রুতবেগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো দীপক।

ধীরেনবাবু তখনও অপেক্ষা করছিলেন। দীপক চিঠির কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে বললে—মনে হচ্ছে, আমার কোন পুরনো শত্রু। রিভলভারের গুলি ছুঁড়েছিল আমাকে লক্ষ্য করে। যাক, আপনার কেস গ্রহণ করলাম আমি। ঠিকানাটা রেখে যান।

একখানা কার্ড রেখে ধীরেনবাবু বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মুখখানা তখন কেমন যেন পাণ্ডুর বলে মনে হলো।

॥ ছয় ॥

ধীরেনবাবুর ঠিকানা নিয়ে দীপক মনে করেছিল তাঁর বাড়িতে একবার গিয়ে তাঁর ভাই বিকাশকে দেখে আসবে।

কিন্তু ঘটনাটা অতদূর এগোবার অবকাশ পেলো না।

দু'দিন পরে।

সেদিন সকালে হঠাৎ দীপকের বাড়ির টেলিফোনটা বেজে উঠল সশব্দে। ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

—হ্যালো, কে ?

—আমি ধীরেন রায়চৌধুরী কথা বলছি।

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী দীপকবাবু।

—আবার কি হলো হঠাৎ ?

—আমার ভাই বিকাশকে তার ঘরে আজ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

—কখন তাকে মৃত বলে আবিষ্কার করা হলো ?

—আজই সকালে। বাড়ির একজন চাকর চা নিয়ে তার ঘরে যায়। অনেক বেলা পর্যন্ত দরজা বন্ধ ছিল। সে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিয়েও খুলতে পারেনি। অগত্যা বাড়ির লোকেদের ডেকে জোর করে দরজা ভেঙে ফেলা হয়।

—তারপর ?

—দরজা ভেঙে দেখা গেল, বিকাশ মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দেহে প্রাণ নেই।

—কিসে তার মৃত্যু হয়েছে ?

—সেটা এখনও জানা যায়নি। ডাক্তারবাবুকে খবর দিলাম। আপনি যদি দয়া করে একবার এদিকে আসেন তো খুব ভাল হয়।

—নিশ্চয়ই। আচ্ছা একটা কথা, আপনার ভাইয়ের মৃত্যু কি আন্‌ন্যাচ্যারাল বাল আপনার ধারণা ?

—তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে হঠাৎ এ ধরনের মৃত্যুর আর কি কারণই বা থাকতে পারে ?

—আচ্ছা, আমি গিয়ে সব দেখছি। এক্ষুণি আসছি।

—ধন্যবাদ !

* * *

—মিনিট কুড়ি পরে।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর গাড়িটা এসে দাঁড়াল নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের ওপরে অবস্থিত জমিদার ধীরেন রায়চৌধুরীর বাড়ির সামনে।

—নমস্কার দীপকবাবু !

ধীরেনবাবু অভ্যর্থনা জানালেন।

—মৃতদেহ কোন্ ঘরে ?

—দোতলার কোণের ঘরটায়। ওটাই বিকাশের শোবার ঘর।

—ডাক্তারবাবু এসেছেন ?

—হ্যাঁ, তিনি এসে পৌঁছে গেছেন।

—কোথায় তিনি ?

—মৃতদেহ পরীক্ষা করছেন।

—পরীক্ষা করে কিছু মন্তব্য করলেন ?

—না। এখনো কিছু বলেননি।

—চলুন তবে সেখানে যাওয়া যাক্।

—আসুন।

ছোট্ট ঘরখানা প্রভাতী রোদে ঝলমল করছে। কে ধারণা করতে পারবে যে, এই সুন্দর ঘরখানার একটি অংশে কাল এই ধরনের একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে?

ঘরের ঠিক মাঝখানে পড়েছিল বিকাশের প্রাণহীন দেহ। চেহারা তার সুশ্রী।

মুখে তার মৃত্যু বুলিয়ে দিয়েছে অদ্ভুত একটা পাণ্ডুরতার ছায়া।

গায়ে কোনও জামা নেই। পরনে ধুতি। মুখে উদ্বেগ বা আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নেই। একজন ডাক্তার দেহটি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলেন। দীপককে দেখে বলে উঠলেন—নমস্কার, মিঃ চ্যাটার্জী।

—একি! আপনিই এ বাড়ির ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান নাকি ডাঃ সেন?

—হ্যাঁ।

—ভালই হলো। তা মৃতদেহ দেখে আপনার কি মনে হয়?

—কাল শেষ রাতে প্রায় চারটার সময় এর মৃত্যু হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পর দেহের তাপ ঘণ্টায় গড়ে চার ডিগ্রি করে কমতে থাকে, সেই হিসাবে।

—বুঝেছি। আর কোনকিছু কি মৃতদেহ দেখে আবিষ্কার করতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ, এটা একটা আন্‌ন্যাচারাল ডেথ। কোনও একটা ভেজিটেবল পয়জন-এ তার মৃত্যু ঘটেছে। তবে শরীরের ভেতরটা পরীক্ষা না করতে পারলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—কি করে আপনি সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হলেন?

—ভেজিটেব্‌ল পয়জনিং-এর যা কিছু লক্ষণ তা বেশ ভাল করেই ফুটে উঠেছে এর দেহে। চোখ-মুখ নীল, মুখে নিঃশঙ্ক একটা ভাব। মানে, ধীরে ধীরে আরামের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছে মৃত্যু।

কিন্তু কোন্ পথে ওর শরীরের ভেতর বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে বলে মনে হয় আপনার ?

ডাঃ সেন মৃত বিকাশের ঘাড়ের ওপরে একটা ছোট চিহ্নের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন—বোধহয় এখান দিয়ে।

—ও। তাহলে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে ওর মৃত্যু ঘটিয়েছে বলেই আপনার ধারণা ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—কিন্তু এমন ক্ষমতাশালী বিষ কি থাকতে পারে যা শরীরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটা সম্ভব ?

—আমাদের দেশে তেমন কোন বিষ না থাকলেও, বিষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান থাকলেই এটা সহজে বুঝতে পারতেন। বর্মায় 'সামু'ই বলে এক ধরনের গাছের রস মানুষের দেহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মৃত্যু ঘটায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এই ধরনের গাছ আছে বলে জানা আছে আমার।

—কিন্তু এদেশে কি করে হত্যাকারী সে বিষ আনতে সক্ষম হলো ?

—আমার মনে হয়, যে লোক বিকাশবাবুকে খুন করেছে সে বিষবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। আর সে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করেছে প্রচুর।

—তাহলে মোটামুটি হত্যাকারী সম্বন্ধে ধারণা পেলাম।

কথা শেষ করে দীপক ঘরের চারিদিকের আসবাবপত্রের দিকে মনোনিবেশ করল।

বুক-সেল্ফ্, র‍্যাক, টেবিল, চৌকি।

কোনও কিছুই কোনও ইঙ্গিত দেয় না।

হঠাৎ একটা জিনিস দীপকের মনোযোগ আকর্ষণ করল। টেবিলের ড্রয়ারে একখানা ডায়েরী। বিকাশের নিশ্চয়ই ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল।

ডাঃ সেনের অলক্ষ্যে দীপক হঠাৎ ডায়েরীটা পকেটে রেখে দিল।

সবকিছু দেখে অবশেষে মন্তব্য করলেন ডাঃ সেন—এটা একটা ক্লীন কেস অব মার্ডার। এক্ষুণি থানায় খবর দিন। আর লাশটাকেও মর্গে পাঠাতে হবে। তাই এখন এটার সংকার চলবে না।

দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নেমে গেলেন নীচের ঘরে।

সেখানে ধীরেনবাবুর সঙ্গে বসেছিলেন আর একজন ভদ্রলোক। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। পেশীবহুল দেহ। পরনে ধুতি, গায়ে সিল্কের চাদর—খালি গায়ে চাদরটি জড়ানো। পায়ে কাষ্ঠপাদুকা।

ধীরেনবাবু পরিচয় করিয়ে দেন।

—ইনি আমার কাকা। অবিনাশ রায়চৌধুরী। আর ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। ইনি ডাঃ সেন।

অবিনাশবাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করেন শুধু। নমস্কারের প্রত্যুত্তর দেবার বা বলবার কোনও প্রয়োজনই যেন বোধ করেন না।

বিশ্রী লাগছিল দীপকের। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে, অবিনাশ-বাবু তার উপস্থিতিটা ঠিক পছন্দ করছেন না!

—উনি ওপাশের অংশে থাকেন বলে শুনেছিলাম না? দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

অবিনাশবাবু বললেন—দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এইমাত্র এলাম।

—ও, মাপ করবেন। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করব আপনাকে।

—বলুন।

—আপনার মামাতো ভাই দুজন এখন কোথায়? ওঁদের সঙ্গে দেখা করা হয়ত প্রয়োজন হতে পারে।

—গৌর আর নিতাই। গৌর শুধু দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর

নেশা নিয়ে ব্যস্ত। বর্মাতেই তো এবার দুমাস কাটিয়ে এসে ঘরে ফিরল। সকালে উঠেই কোথায় বেরিয়েছে। আর নিতাই বোধহয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভোরে উঠেই বের হয়েছে। এখনও ফেরেনি। এখন পর্যন্ত ও বিকাশের মৃত্যুর খবর পায়নি। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন তো?

—এমনিই।

—আপনি কি মনে করেন যে, এই মৃত্যুটা স্বাভাবিক কারণে নয়?

—অবশ্যই নয়। ডাঃ সেনের অন্ততঃ তাই মত। আচ্ছা আজকের মত চলি ধীরেনবাবু। পরে সবকিছু খবর জানবার চেষ্টা করবেন। তবে এ কেসের সমাধান হতে বেশ ক'দিন যে সময় অবশ্যই লাগবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

দীপক কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় ধীরেনবাবুর কাকা তার সম্বন্ধে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলছেন—শুধু শুধু বাড়িতে আবার গোয়েন্দার ঝামেলা এনে ঢোকালে কেন বাপু?

উত্তরে ধীরেনবাবু কি বললেন তা দীপক ভাল শুনতে পেল না। দীপকের মাথায় তখন অজস্র চিন্তা জট পাকাচ্ছিল।

॥ সাত ॥

অপরাহ্ণ।

সন্ধ্যা হতে অল্পই দেরি আছে।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ব্যালকনিতে বসেছিল দীপক। হাতে ধরা ছিল একটা বিলিতি ডিটেকটিভ উপন্যাস। কিন্তু মন তার সেটাতে আদৌ ছিল না। একাগ্রমনে অন্য কি একটা চিন্তায় বিভোর ছিল যেন।

—একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান কর্তা।

চাকর ভজুয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—এখানে পাঠিয়ে দে।

নেহাৎ আপনা থেকেই কথাটা বলে ফেলল দীপক। কথা টা সে কোন চিন্তা করে বললে বলে মনে হোল না।

মিনিট খানেক পরে শোনা গেল শাড়ির ঘস্-ঘস্ শব্দ। একজন অপরিচিতা তরুণী প্রবেশ করল। অবিবাহিতা। দীপক মনে করলো বোধহয় ভুল করে মেয়েটি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছে।

—আপনি ভুল করে এখানে আসেননি তো?

—না। আপনিই কি দীপক চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ। আমি তো আপনাকে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

—মনে হবে কি করে? আপনি এখনই তো আমাকে প্রথম দেখছেন।

—তাই নাকি? কিন্তু কি জন্যে হঠাৎ আপনি আমার কাছে—

—আপনি কি ধীরেনবাবুর ভাই বিকাশবাবুর মৃত্যুর তদন্তভার গ্রহণ করেছেন?

—আপনার অনুমান অভ্রান্ত।

—এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমার বলবার আছে।

—বলুন।

—যতদূর জানি, বিকাশবাবু একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বছর তিনেকের ওপর তাঁর সঙ্গে আমার মানে আমাদের পরিবারের পরিচয়। তাঁর এই মৃত্যুটির মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

—সে কি! কাকে আপনি দোষী বলে অনুমান করেন?

—দেখুন, প্রথমে সন্দেহ ছিল ধীরেনবাবুর ওপর। কিন্তু পরে সে সম্বন্ধে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—কেন?

—ধীরেনবাবু ওঁকে ঠিক সুনজরে দেখতেন না বলে জানি।

—তা অস্বাভাবিক নয়।

—আমার মনে হয় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির অংশটা সম্পূর্ণ নিজের হাতে···

—বলুন।

—এসব কথা কি এভাবে বলা উচিত দীপকবাবু?

দীপক বললে—আমার বাড়িতে আপনি নির্ভয়ে সব কথা বলতে পারেন।

—বেশ, তবে শুনুন। ওঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ভয়-ভাব লক্ষ্য করতাম ওঁর মধ্যে।

—ওর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

—তা প্রায় বছর তিনেকের ওপর হবে।

—আপনাদের পরিচয়টা কি সূত্রে ?

—ওঁর সঙ্গে আমার কিছুটা অন্তরঙ্গতা—

—ও, বুঝেছি। আপনাদের মধ্যে কি বিবাহ হওয়ারও কথাবার্তা হয়েছিল নাকি ?

—হ্যাঁ। বাবার ইচ্ছা ছিল, ওঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

—সে ইচ্ছাটা ওঁর মনে বাসা বাঁধে কেন ?

—উনি ছিলেন একজন কৃতী ছাত্র। অর্থেরও তো অভাব নেই। তাছাড়া আমাদের দুজনেরই মত ছিল। তাই—

—এবার বলুন।

—উনি যেন কারো কাছ থেকে একটা ভীতিজনক কোন কিছুর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

—কি করে বুঝলেন ?

মেয়েটি চারদিকে একবার বেশ ভালো করে তাকিয়ে নিল। তারপর বললে—একদিন উনি আমাকে চুপি চুপি ডেকে কতকগুলো কথা বললেন। মৃত্যুর বোধহয় দিন পনেরো আগে বলেন যে, সীতা তোমার সঙ্গে আমার মিলন বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

আমি তার উত্তরে প্রশ্ন করেছিলাম—কেন একথা বলছেন আপনি ?

তার উত্তরে উনি বলেছিলেন—আমার জীবন যে ঠিক কতদিন এমনি-ভাবে চলবে তা আমি জানি না। আমি এ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন, তাতে শুধু লেখা ছিল : সাতদিনের মধ্যে উপযুক্ত জবাব না পেলে তোমার নিশ্চিত মৃত্যু জেনে রেখো বিকাশ।

—সে চিঠিখানা আপনার কাছে আছে ?

—না। সেখানা উনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

-আচ্ছা, আর একটা কথা সীতাদেবী।

—এ কি! আমার নামটা আপনি জানলেন কি করে?

দীপক হেসে বললে—আপনার কথার মধ্য দিয়ে একটু আগেই সেকথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যাক, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

—কি প্রশ্ন বলুন?

—ঠিক কোন ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছে বলে আপনার মনে ধারণা?

—সেটা আজও পর্যন্ত বুঝতে পারিনি দীপকবাবু। শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে যে, কেউ যেন ওঁকে ব্ল্যাকমেল করেছিল। আর তাদের কোন ব্যাপারেই হয়ত—

—আচ্ছা, আপনার বাবার নাম?

—সমীর ব্যানার্জী। আমার ঠিকানাটাও রেখে দিন। তেইশ নম্বর রামমোহন সাহা লেন।

নমস্কার জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সীতা।

॥ আট ॥

সন্ধ্যার পর।

দোতলায় শোবার ঘরে একটা কোণে হেলান দিয়ে বিকাশের ডায়েরীর পাতায় মনোযোগ দিল দীপক। কয়েক পাতা উল্টে একটা পাতায় লেখা: 'জীবন শুধু কাব্যময়ই নয়, রূঢ় বাস্তবও আছে তার মাঝে লুকিয়ে। কিন্তু কেন এমন হয়? ভুল ত মানুষ করবেই। কিন্তু একটা ভুলের জন্যে আজীবন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন?'

এর পর কয়েকটি পাতায় শুধুমাত্র দৈনন্দিন কাজকর্মের তালিকা। দীপক ধীরে ধীরে উল্টে যেতে থাকে। তারপর আর এক পাতায়: 'না, এ ভুল নয়। এ হয়ত স্বভাবধর্ম। আর যদি ভুলই হয়, ক্ষতি কি?

আমি সবিতাকে ভালবাসিনি মোটেই। কিন্তু সে জোর করে আমাকে বশ করতে চেয়েছিল। আমার অর্থের প্রতি তার ছিল আকর্ষণ। হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি? হয়ত আমার মনে একটা সাময়িক দুর্বলতা এসেছিল কোনদিন। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে একদিন আমাকে দাবি করল। কিন্তু অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে তার। আমি যে তখন চিনেছি তার সত্যিকারের স্বরূপ। সীতা আমার জীবনে এনে দিয়েছে ফুল ফোটানোর ছন্দ—দিয়েছে নতুন প্রেরণা—অপরিসীম আনন্দ। আমি সীতার ডাকে সাড়া দিতে আজ বাধ্য। সবিতার কোনও অধিকারই নেই আমাকে দাবি করবার।'

এর ঠিক দু'তিনটা পাতা পরে লেখা: 'উঃ, কি নিষ্ঠুর মেয়ে এই সবিতা! শয়তানী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সে কিনা ভয় দেখিয়ে জোর করে আমাকে জয় করতে চায়! সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসি। তা বুঝুক, কিন্তু তাই বলে জোর করে আমাকে ভয় দেখাতে চায়? অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়।

আমি যখন তার বাড়ির ঘরে বসে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম তখনই সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আর ঠিক সেই সময়েই কালো পোশাক পরা ঐ মূর্তিটির আবির্ভাব। উঃ! ভাবতেও এখন আমি শিউরে উঠি।

মূর্তিটির সারাদেহ কালো পোশাকে আবৃত। মুখেও কালো কাপড়ের আবরণ। হাতে তার যে রিভলভারটা ছিল সেটা যে আসল, সে সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ ছিল না আমার।

কিন্তু কে এই লোকটি? আর আমার সঙ্গে সবিতার মিলনেই বা তার কি স্বার্থ? কেনই বা এমনি ভয় দেখিয়ে বলল যে, সবিতার কথার বিরুদ্ধে গেলে সে আমাকে হত্যা করবে?

ছি, ছি, একি বিশ্রী প্রস্তাব!

না, না, এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি কিছুদিন সময় নিয়েছি ভেবে দেখবো বলে। তাতে অবশ্য সে অমত করেনি। কিন্তু কেন সে এমন করল? কি তার উদ্দেশ্য?'

এর পর প্রায় সাত আট পাতার পর লেখা: 'সীতা, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি। জীবনে যত বাধা আসে আসুক—আসুক প্রতিবন্ধকতা আর ঝঞ্ঝাবিপর্যয়। তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করতে পারি না। পারি না সুখী হতে। অন্য কোনও বিভীষিকা আমাকে পিছিয়ে দিতে পারবে না। এতটুকুও বিভ্রান্ত হব না আমি।'

ডায়েরীর পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে কেমন যেন একটু ঘুম পাচ্ছিল দীপকের।

নিশ্চিন্ত মনে সোফায় গা এলিয়ে দেয় দীপক।

ধীরে ধীরে গাঢ় নিদ্রার আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেয় সে।

হালকা হাওয়ার স্পর্শে তার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। শ্রান্তি আর অবসাদ কাটিয়ে ওঠার মত নিটোল নিদ্রা তার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে। কতক্ষণ কেটে গেছে জানা নেই তার।

খুট!

অস্পষ্ট শব্দ। ঘুম ভেঙে যায় দীপকের।

ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার।

অবাক হয়ে যায় দীপক। দৃষ্টিটাকে ভাল করে মেলে ধরে। সে যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ঘরের আলোটা জ্বলছিল। কিন্তু এখন নিভিয়ে দিল কে?

অস্পষ্ট পদশব্দ।

খচ্ করে জ্বলে উঠলো একটা টর্চ।

ইতস্ততঃ টর্চের আলোটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেন কিসের সন্ধানে। দীপক সহসা চমকে উঠে বসল বিছানার ওপর। মাথার বালিশের নিচে হাত দিয়ে রিভলবারটা বের করে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—খবরদার! পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব। এতটুকু চালাকি করবার চেষ্টা করো না।

কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

সময় কেটে চলে। সেকেণ্ড, মিনিট···পনেরো মিনিট কেটে গেল।

ধীরে ধীরে উঠে সুইচ বোর্ডের কাছে যায় দীপক। সুইচ টিপে দেয়। এক ঝলক আলোয় ঘরটা হেসে ওঠে।

কিন্তু ঘরে কোন লোকের অস্তিত্বমাত্র নেই। জানালাটা খোলা। নিশ্চয়ই গরাদবিহীন জানালা দিয়ে লোকটা নিঃশব্দে পলায়ন করেছে।

হঠাৎ টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই চমকে ওঠে দীপক। টেবিলের ওপর থেকে ডায়েরীটা উধাও হয়েছে। নিশ্চয়ই এ সেই নৈশ অতিথির কাজ।

ঘরের মেঝেয় এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে শুধু। দীপক কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ে। তাতে লেখা :

দীপক চ্যাটার্জী,

ডায়েরীটা আমার অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। বিকাশকে যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, তাকে ভয় দেখিয়ে বহুবার টাকা আদায় করে অবশেষে তার সুন্দর জীবনের ওপর অকালে যবনিকা টেনে দিয়েছে, তাকে আমিও শাস্তি দিতে উৎসুক। তাই নিয়ে গেলাম।

কিন্তু শুধু হত্যাই নয়, এর পেছনে আছে আর একটি চক্রান্ত। যে হত্যাকারীকে নিয়োগ করেছে এই কাজের জন্য, আমার হাতে তারও নিস্তার নেই জেনো। প্রীতি নিও। ইতি—

মিস্‌ট্রি গার্ল।

চিঠিটা ভাল করে পড়ে দীপক। এ কি প্রহেলিকা? মিসট্রি গার্ল কে? আর বিকাশকে যে ভয় দেখিয়েছিল সেই লোকটিই বা কে?

জটিল ঘটনার গ্রন্থিগুলো তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। কি করে এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব?

এই বিচিত্র রহস্যের কোনও সমাধানের পথ খুঁজে পায় না দীপক।

॥ নয় ॥

পরদিন সকাল।

দীপক ড্রইংরুমে বসে রাতের ঘটনাগুলির বিষয় চিন্তা করছিল। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে ?

—আমি ইন্‌স্পেক্টর তরফদার কথা বলছি। মৃত বিকাশ রায়চৌধুরীর কেসটির তদন্তভার থানা থেকে আমার ওপরে দেওয়া হয়েছে।

—ও, বুঝেছি। নতুন কিছু খবর-টবর পেলেন নাকি ?

—হ্যাঁ, শুনলাম আপনিও কেসটার ব্যাপারে উৎসুক। তাই আপনাকে জানাচ্ছি। কাল রাতে বিকাশবাবুর কাকা অবিনাশবাবুকে কে নাকি আক্রমণ করেছিল তাঁকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি খুব বেশী আহত হননি। আততায়ী তাঁকে ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করেছে কোন অজ্ঞাত কারণে।

—আপনি কি সেখানে গিয়ে তদন্তকার্য শেষ করে ফেলেছেন ?

—হ্যাঁ। বিশেষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি।

—আপনার কি ধারণা যে মৃত বিকাশবাবুর খুনীই অবিনাশবাবুকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল ?

—আপনার অনুমান ঠিক।

—কিন্তু এই কেসটার তদন্ত-বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হলেন ?

—সত্যি কথা বলতে কি, অনেকের ওপরই সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু ঠিক যে কে খুনী, এখনও তা বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা আমি একবার অবিনাশবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখি কতদূর সফল হওয়া যায়। আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

* * *

আধঘণ্টা পর।

দীপকের গাড়ি অবিনাশবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

দারোয়ান সেলাম ঠুকে প্রশ্ন করে—কাকে চাই?

—অবিনাশবাবুর সাথে দেখা করতে চাই।

দারোয়ানের হাতে একটা কার্ড দিয়ে দীপক অপেক্ষা করতে থাকে।

এমন সময় হন্‌-হন্‌ করে প্রবেশ করল একজন লোক। পরনের ধুতিটা উঁচু করে তোলা। গায়ে আধময়লা সার্ট। বগলে একখানা খাতা। গেটটা পেরিয়ে সামনের দিকে সরে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ ধীরেনবাবুকে ওপর থেকে নেমে আসতে দেখা গেল।

ধীরেনবাবুকে দেখে লোকটি বললে—নমস্কার স্যার। তারপর শরীর-টরীর ভাল আছে ত?

ধীরেনবাবু অবাক হয়ে যাবার ভঙ্গিতে বললে—আপনি কে তা ত বুঝতে পারছি না। কোত্থেকে আসছেন?

—সে কি স্যার? আমি,—মানে—বলাই, হুজুর আমাকে চিনতে পারছেন না?

—ড্যাম ইট! যত সব বাজে বিরক্ত!

কথা না বাড়িয়ে মুখটা ঘুরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ধীরেনবাবু বেরিয়ে গেলেন অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে। দীপকের দিকে পর্যন্তও ফিরে তাকালেন না।

বলাই বললে—আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি। উনি আমাকে চিনতেই পারলেন না, এ কেমন কথা?

বলাই দোতলায় উঠে গেল জোরে জোরে পা চালিয়ে। তার ভাব দেখে

স্পষ্টই বোঝা যায় সে এ-বাড়িতে প্রায়ই আসে। এ-বাড়ির সকলের সঙ্গেই তার বেশ পরিচয় আছে।

একটু পরেই দারোয়ান নেমে এসে বললে—বাবু আপনাকে ভেতরে ডেকেছেন হুজুর।

দীপক ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সে অবিনাশবাবুর ঘরে প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল অবিনাশবাবু কার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলছেন—শয়তান কোথাকার! বদমায়েসির আর জায়গা পাওনি? কি মতলবে তুমি এখানে এসেছ বলত?

যার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হলো সে আর কেউ নয়—স্বয়ং বলাই।

বলাই দীপককে প্রবেশ করতে দেখে বললে—দেখুন ত স্যার, একি অন্যায়? আমি হলুম গিয়ে ওঁর পার্টনার। দীর্ঘদিনের পরিচয় ওঁর সঙ্গে। আর বলছেন কিনা আমাকে চেনেন না! একি অন্যায় কথা স্যার!

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই বলাইয়ের কথা শুনে হো-হো-করে হেসে উঠল।

দীপক কোন উত্তর দিল না।

বলাই আপন মনেই বলতে লাগল—একি অন্যায় কথা বড়বাবু? আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন নাকি? আমি কোথায় কাজের কথা বলতে এসেছি, আর আপনি……

—কোথাকার কে তার ঠিক নেই, উনি এলেন কাজের কথা বলতে! অবিনাশবাবু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে হেঁকে উঠলেন—দারোয়ান! আমার অনুমতি না নিয়ে এসব বাজে লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় কেন? একে এক্ষুণি ঘর থেকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।

অবিনাশবাবুর চীৎকার শুনে দারোয়ান দৌড়ে আসে।

অবিনাশবাবু বলেন—একে এক্ষুণি ঘাড় ধরে…

কিন্তু দারোয়ান অবিনাশবাবুর হুকুম শুনে অবাক হয়ে যায়। সে

বলাইয়ের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। তার ভাব দেখে দীপক বুঝতে পারে যে দারোয়ান প্রায়ই বলাইকে এখানে আসতে দেখেছে। তাই মনিবের হুকুম শুনে অবাক হয়ে গেছে সে।

বলাই কিন্তু অবিনাশবাবুর কথা শুনে চীৎকার করে বলে—থাক, ঘাড় ধরে আর বের করে দিতে হবে না। আমি নিজে থেকেই যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে আমাকে ঠকাবার উপযুক্ত প্রতিশোধ আমি নেব। যখন ব্যবসা করতে আমার করকরে টাকাগুলো নিয়েছিলেন, তখন ত ভালভাবেই চিনতে পারতেন আমাকে। কিন্তু এখন সে সব ত আর নেই, তাই চিনতে পারছেন না। ছিঃ, আমারই অন্যায় এভাবে আসা।—বলাই রাগে বক-বক করতে করতে বেরিয়ে যায়।

বলাই বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই অবিনাশবাবুর চেহারা অনুরূপ ধারণ করে। তিনি হেসে দীপককে অভ্যর্থনা করে বলেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। একটি জরুরী ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেলে আনন্দিত হব।

দীপক অবাক হয়ে যায়।

ক'দিন আগে এই অবিনাশবাবুই তার সঙ্গে অন্য ধরনের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু আজকের অবিনাশবাবু যেন অন্য মানুষ।

—কি ব্যাপার বলুন তো?

—কাল রাতে কে যেন আমার ঘরে প্রবেশ করে একটি ধারাল ছোরার আঘাতে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ আগে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম।

দীপক বললে—হ্যাঁ, ঘটনাটা তরফদারের মুখে শুনেছি বটে।

—একটু চা আর সামান্য কিছু খাবার যদি আপনি···

কথা না বাড়িয়ে দীপক বললে—না, আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। জরুরী কতকগুলি কাজ আছে।

দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় দীপক। সে দারোয়ানের হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে প্রশ্ন করে—বলাইবাবু কোনদিকে গেলেন ?

দারোয়ান দেখিয়ে দেয়—ঐদিকে—

দীপক গাড়িতে উঠে দ্রুত গাড়ি চালায়।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দেখা যায় বড় রাস্তাটা ধরে দ্রুত গতিতে বলাই এগিয়ে চলেছে।

দীপক ঠিক তার পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বললে—গোটা কয়েক কথা ছিল আপনার সাথে। যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়িতে উঠে আসতে পারেন।

বলাই আন্দাজ করেছিল, দীপক বোধহয় অবিনাশবাবুরই বন্ধু। তাই সে বিরক্তিপূর্ণভাবে বললে—না-না, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। আপনাদের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

দীপক বললে—আমি ওঁর মত নই। আমার সঙ্গে আসতে কোনও ভয় নেই আপনার।

বলাইকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দীপক নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়।

গাড়ি ছুটে চলে কোলকাতার রাজপথের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে। বলাই কোন আপত্তি করে না আর।

॥ দশ ॥

দীপকের বাড়িতে প্রবেশ করে বলাই অবাক হয়ে যায়। বললে—ইউ আর এ রিচম্যান। এত বড় বাড়ি, মোটর গাড়ি—

দীপক বললে—কিন্তু আমাকে আপনার বন্ধু বলেই মনে করতে পারেন।

ড্রইংরুমে বলাইকে বসিয়ে দীপক চাকরকে চা ও খাবার আনতে বলে।

খাবার খেয়ে তৃপ্ত হয়ে বলাই বললে—আপনি ভাল লোক স্যার। ওই শয়তানটার মত নন।

দীপক প্রশ্ন করে—আচ্ছা, আপনাকে উনি তাড়িয়ে দিলেন কেন?

বলাই রেগে উঠে বললে—ওরা হচ্ছে শয়তানের একশেষ। উঃ এ রকম ধূর্ত লোক জীবনে দেখিনি! শুধু আমাকেই ঠকায়নি, শুনতে পেলাম, শয়তানেরা এমনি অনেক লোককেই ঠকিয়েছে।

—কি ব্যাপার?

—এই লোক-ঠকানো বিদ্যায় ওরা পারদর্শী। ঐ ধীরেন আর ওর কাকা অবিনাশবাবু দুজনেই সমান।

—সেকি!

—হ্যাঁ, আমাকে ব্যবসার লোভ দেখিয়ে—

—টাকা আদায় করেছিল ত?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা?

—হাজার দশেক।

—কিন্তু আপনি এভাবে টাকা দিলেন কেন?

—আমাকে মোটা লাভ দেবেন বলে লোভ দেখান। তাছাড়া ওঁরা বড়লোক বলে ওঁদের প্রথমে অতটা আর অবিশ্বাস করিনি।

—আপনি কিছু লিখিয়ে নেননি ?

—না, বিশ্বাস করে দিয়েছিলাম। তাই একেবারে এভাবে পথে বসালে। আমারই টাকায় ব্যবসা চালাচ্ছে; আর আমাকে চিনতে পারে না। মজাটা দেখলেন ত ?

দীপক বললে—হ্যাঁ, সুযোগমত আপনার ওপরে আঘাত হেনেছে আর কি। আর যেন বিশ্বাস করে যার তার হাতে টাকা দেবেন না।

—না মশাই। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায় ? একবার ঠকেছি বলে কি বার বার—আর তাছাড়া টাকাও নেই। উঃ, কি ভাবে আমাকে পথে বসাল দেখেছেন ত স্যার ! কিন্তু আমিও আপনাকে বলে রাখছি স্যার,—আমি এর প্রতিশোধ নেব দেখবেন। বলাইকে ঠকালে তার উপযুক্ত শাস্তি পেতে হয়।

একটু বাদে বলাই বললে—এবার তাহলে উঠি স্যার ?

দীপক বললে—কোথায় যাবেন এখন ?

—যাব আর কোথায় ? বাড়ির দিকে। বাড়িতে মেয়েটা হয়তো এতক্ষণ পথ চেয়ে বসে আছে।

—মেয়ে ?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী মারা গেছে অনেক দিন। মা-মরা মেয়েটাকে আমিই মানুষ করে তুলেছি।

—আপনার মেয়ের বয়স কত ?

—কার ? সবিতার ? সবিতার বয়স এখন ধরুন, বছর কুড়ির মতন হবে। বিয়ের বয়স হয়ে গেছে অনেক দিন। কিন্তু টাকার অভাবে এখনও কোন বন্দোবস্ত করতে পারছি না স্যার।

—সবিতা ! দীপকের মনে পড়ে যায়। বিকাশের ডায়েরীতে যে

মেয়েটার নাম পাওয়া গেছে তার নামও সবিতা। যে সবিতা ভয় দেখিয়ে বিকাশকে বিয়ে করতে চেষ্টা করেছিল।

অদ্ভুত যোগাযোগ!

অবাক হয়ে দীপক ভাবতে থাকে কি নিখুঁত যোগাযোগ। কিন্তু যেন রহস্য আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

—আজকের মত উঠি স্যার। নমস্কার!

ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে বলাই। দীপকের বাড়ি পার হয়ে বড় রাস্তায় পা দিল সে।

দীপক জানালা দিয়ে তাকায় ওর অপসৃয়মান দেহটার দিকে।

গুড়ুম।—

গুলির শব্দ।

আঃ—আ-আ-আ—

বলাই লুটিয়ে পড়ে রাস্তার উপরেই।

আশ্চর্য, একটু আগেই লোকটা তার ঘর থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে গেল, এমন সময় হঠাৎ গুলি করল কে?

দীপক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দ্রুত পায়ে। গিয়ে উপস্থিত হয় বলাইয়ের মৃতদেহের পাশে।

আততায়ীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সে যেন সবার চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দীপক ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখল। গুলিটা এসে লেগেছে বলাইয়ের ঠিক বুকে। এক ঝলক তাজা রক্ত বেরিয়ে পথের ধুলাকে ভিজিয়ে দিয়েছে।

বার কয়েক একটু নড়ে-চড়েই বলাইয়ের দেহটা স্থির হয়ে যায়।

মৃত্যুর কালো ছায়া বলাইয়ের মুখে আর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

হঠাৎ বলাইয়ের পড়ে-থাকা দেহ থেকে কিছু দূরে একটা জিনিসের প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

মৃতদেহের হাত দশেক দূরে পড়ে ছিল একটা সাদা কার্ড। কি যেন কতকগুলো কথা তাতে লেখা। কে ফেলে গেল ওটা?

দীপক এগিয়ে গিয়ে কার্ডটা তুলে নেয়। তাতে লেখা:

গোয়েন্দাপ্রবর,

এখনও অহঙ্কার? এখনও মিথ্যা গর্ব? আর এক পা-ও এগিয়ো না। তোমার চোখের সামনে একজনকে হত্যা করলাম,—তুমি কি বাধা দিতে পারলে?

শেষবারের মত বলছি, এখনও সাবধান না হলে তোমার জীবনের ওপরেও যবনিকাপাত হবে এমনিভাবে। ইতি—

জনৈক বন্ধু।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে চারদিকে চেয়ে দেখে দীপক।

পথের পাশেই একটা ঝোপ। সেটা এখন আর নড়ছে না। বোধ-হয় আততায়ী ওখান থেকেই গুলি করে একটু আগে পালিয়ে গেছে।

এছাড়া তার অদৃশ্য হবার আর কোনও পথই খোলা নেই।

দীপক বাড়িতে ফিরে এল কার্ডটা হাতে নিয়ে। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। এক্ষুণি ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিতে হবে লালবাজারে।

দীপককে দেখে তখন রীতিমত চিন্তিত মনে হয়।

॥ এগারো ॥

বলাইয়ের ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে দীপকের খুব বেশী বেগ পেতে হলো না। পুলিশ মর্গ থেকে মৃতদেহটা নেবার জন্য এসেছিল তার মেয়ে সবিতা। তার কাছ থেকেই ইন্‌স্পেক্টর তরফদার তার বাড়ির নম্বরটা চেয়ে রেখেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর দীপকের গাড়িখানা দেখা গেল বলাইয়ের বাড়ি থেকে কিছু দূরে পার্ক করছে। চুপচাপ গিয়ে দেখতে হবে কোন রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করা যায় কি-না।

পথটা নিরালা।

মহানির্বাণ রোডের এই অঞ্চলটায় লোকবসতি বিরল।

বাড়িখানা আগাগোড়া অন্ধকারে আবৃত। কোথাও সামান্যতম কোনও মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। দীপক পেছনের দিকে ছোট্ট মাঠখানায় গিয়ে দাঁড়াল। একপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে।

ধীর পদবিক্ষেপে চারিদিকে চাইতে চাইতে পেছনের উঁচু পাঁচিলটাতে উঠে পড়ল দীপক।

তারপর এক লাফে বাড়ির মধ্যে গিয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও জন-মানবের কোন চিহ্ন নেই।

ছোট্ট দোতলা বাড়ি।

নীচের তলায় ছ'খানা ঘর। উপরের তলায় চারখানা। একতলা

পেরিয়ে কোণের দিকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে থাকে দীপক। মার্জারের মত ভীত-ত্রস্ত তার গতি!

দোতলার একখানা ঘরে জ্বলছে মৃদু নীল আলো। পথের দিকের জানালা বন্ধ থাকায় এ ঘরটি অন্ধকার মনে হয় বাইরে থেকে।

দীপক ধীর পদক্ষেপে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারল।

ছোট্ট ঘরখানা। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই।

সোফায় পাশাপাশি দুটি মানুষ বসে। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী।

দুজনেই দীপকের দিকে পেছন ফিরে বসেছিল। দীপক কারো মুখই ভাল করে দেখতে পেল না। তবে আন্দাজে বুঝল, নারীটি সবিতা ছাড়া অন্য কেউ নয়। পুরুষটিকে ঠিক এতদূর থেকে চিনতে পারল না সে।

দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল কি একটা বিষয় নিয়ে। দীপক কান পাতল।

সবিতা বলছিল—তুমি সেদিন বিকাশকে যে-ভাবে ভয় দেখালে তাতে আমি ত অবাক। কিন্তু বেচারা শেষে মরে গেল। কে যে ওকে মারল ঠিক বুঝতে পারলাম না।

লোকটি বললে—আমি তাকে ভয় দেখালাম, সে তোমাকে বিয়ে না করলে তাকে হত্যা করা হবে। ওটি আসলে ভয় দেখাবার জন্যেই। তোমাকে সে বিয়ে করে, তা আমি চাইনি। ভয় দেখিয়েছিলাম শুধু ব্ল্যাকমেল করে কিছু টাকা আদায়ের মতলবে।

সবিতা বললে—তা আমিও জানি। আসলে তোমার সঙ্গে আমারও ত অনেক দিনের কথাবার্তা—

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার বাবাও গরীব ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ত আর টাকা পাওয়ার উপায় ছিল না। কাজেই এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না আমার সামনে।

—তা ঠিক। কিন্তু বাবাকে হঠাৎ হত্যা করল কে?

—তাই ত ভাবছি। সীতার সঙ্গে বিকাশের ভালবাসা ছিল জেনে

আমি যখন তাকে ব্ল্যাকমেল করব ভাবছি, ঠিক সেই সময় হত্যাকারী তাকে শেষ করল। এদিকে তোমার বাবাকেও এভাবে—

সবিতা বললে—গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত আমাকেই না সন্দেহ করে বসেন।

—না-না পাগল নাকি!

—কিন্তু বাবাকে যারা এভাবে পথে বসিয়ে হত্যা করতে পারে, তাদের কথা ভাবতেও আমার মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছে।

—আমি এর প্রতিশোধ নেব সবিতা।

—কার ওপর?

—সবার ওপর। যে বিকাশকে খুন করে আমাদের বিভ্রান্ত করেছে এবং যে তোমার বাবাকে খুন করেছে। সে সীতাকে পর্যন্ত গ্রাস করতে চায়।

—সে কি!

—হ্যাঁ, সবিতা।

—সেই জন্যেই কি বিকাশবাবু নিহত?

—ঠিক জানি না। মনে হয় সম্পত্তির ব্যাপারেই।

—কিন্তু এসব কি জটিল প্রহেলিকা বলো ত?

—প্রহেলিকা নয়, ষড়যন্ত্র।

—তুমিও কি এই ষড়যন্ত্রের জালে জড়িত নও বলতে চাও?

—অবশ্যই নই। সে প্রমাণ পরে পাবে। যাক, এর মধ্যে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

—তার চেয়ে আমরা এখান থেকে পালাই চল।

—কোথায়?

—যেখানে কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। সেখানে গিয়ে দুজনে মনের সুখে নীড় বাঁধতে পারব। কি প্রয়োজন ষড়যন্ত্রগুলোর মধ্যে মাথা গলিয়ে?

—প্রয়োজন আছে সবিতা, পরে জানতে পারবে। আর যাই হোক, আমাদের গায়ে হাত তুলতে পারবে না কেউ।

হঠাৎ অভূতপূর্ব একটা পরিবর্তন।

দীপক অবাক হয়ে গেল। সারা গায়ে রোমাঞ্চের শিহরণ জাগলো তার।

সামনের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল।

সেখান দিয়ে ঘরের মধ্যে একটি মূর্তি প্রবেশ করল। সারাদেহ তার কাল কাপড়ে আবৃত, মুখেও কাল আবরণ, দু'হাতে দুটি উদ্যত পিস্তল।

—তোমাদের গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারুক আর নাই পারুক, কিন্তু আমার বিচারে কারো মুক্তি নেই জেনো।

—কে তুমি ?

আঁতকে ওঠে সবিতা ও তার সঙ্গের লোকটি।

—আমি হচ্ছি মিস্ট্রি গার্ল। আর্তের বন্ধু। শয়তানের যম। হতভাগ্য বিকাশ আর বলাইয়ের মৃত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। এই ষড়যন্ত্রের মূলে যারা আছে, তাদের প্রত্যেকের শাস্তি আমি চাই।

দু'জনে স্তব্ধ।

মিস্ট্রি গার্ল বলে ওঠে—সবিতা সেদিন তুমি এর সাহায্যে বিকাশকে ভয় দেখিয়েছিলে কেন ?

সবিতা চীৎকার করে ওঠে—জানি না। সত্যি কিছু জানি না আমি।

—ভুল। সম্পূর্ণ ভুল তোমাদের। মিথ্যে কথা বলে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না কেউ।

প্রাণ খোলা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে মিস্ট্রি গার্ল। তারপর বলে—আজকের মত আসি। আবার দেখা হবে।

মিস্ট্রি গার্ল অদৃশ্য হয়ে যায়।

দীপক ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়ে ভাবতে থাকে।

তারপর নিঃশব্দে নিঃসীম আঁধারের বুকে অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

॥ বারো ॥

পুরুষ বা নারীর ভাগ্যবিধাতা যেন দুঃখ-দুর্দশা দিয়েই সবাইকে তৈরি করে থাকেন।

সীতার জীবনেও ঘটেছিল অনেকটা তাই।

সীতার বাবা সুনীল ব্যানার্জী ছিলেন গরীব। সীতা তাঁর বড়ো মেয়ে। এছাড়া আরো তিন চারটি ভাইবোন তার।

তাই সীতা নিশ্চিত জানত যে, দুঃখই তার সারাজীবনের একমাত্র সঙ্গী।

সুনীলবাবু সামান্য মাইনের চাকুরে।

এই সামান্য মাইনের টাকায় সংসার চলে না। এর মধ্যেও তিনি অনেক কষ্টে সীতাকে ম্যাট্রিক পাস করান।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করার পর সীতার বাবা তাকে একদিন বললেন—মা, এবার তোর বিয়ের ব্যবস্থা করি, কি বল?

সীতা তার উত্তরে বলেছিল—বাবা, আমাকে তুমি তোমার বড় মেয়ে মনে না করে, মনে ক'রো বড় ছেলে।

—কেন?

—আমার ওপরেই আমার ভাইবোনদের ভবিষ্যৎ তৈরি করবার বিরাট দায়িত্ব। তাই আমি চাকরি করব ঠিক করেছি।

—তাতে অনেক বাধা আছে মা। সীতার বাবা বললেন।

কিন্তু সীতা অটল, অনড়। সে মনে মনে যা প্রতিজ্ঞা করেছে তা সে রক্ষা করবেই।

অগত্যা সুনীলবাবু মত দিলেন মেয়ের চাকরিতে।

সীতা চাকরি নিল একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে, সেটা একটা লিমিটেড কোম্পানী। বিকাশের কাকা অবিনাশবাবু সে ফার্মের অংশীদার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রতিদিন বেলা দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করতে হয় সীতাকে। এর মধ্যে আধঘণ্টা টিফিনের ছুটি পায়।

সীতা মুখ বুজে কাজ করে যায়। যেন কাজের নেশায় বিভোর।

মাঝে মাঝে ডাক পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘর থেকে। সীতা যায়। কথাবার্তা বলে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসিখুশীভাবে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেন। সীতা এড়িয়ে যায়। কাজের কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই বলতে চায় না সে।

এমনিভাবেই দিন চলে···

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন কি একটা কাজে অবিনাশবাবু বিকাশকে পাঠালেন সীতার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় হল দু'জনের।

সীতার বাবা স্থির করলেন, বিকাশের সাথেই সীতার বিয়ে দেবেন। বড় ঘরে বিয়ে হলে তার ভাবনা-চিন্তারও অনেকটা লাঘব হবে।

কিন্তু ভাগ্যকে উল্টে ফেলা মানুষের সাধ্য নয়।

বিকাশ একদিন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হলো। এ বিষয়ে সামান্যতম কল্পনাও করতে পারেনি সীতা।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাত যখন সীতার সমস্ত কল্পনাকে ধুলিস্যাৎ করে দিল, তখন সে স্থির করল, আর সে কোনদিনই বিয়ে করবে না।

এমন কি, এ চিন্তা মনেও আনবে না সে। নির্বিবাদে চাকরি করবে।

কিন্তু তার সব কল্পনা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ভাগ্য তার উপর হানল চরম আঘাত।

বিকাশের মৃত্যুর দিনসাতেক পরের কথা। সেদিন তার ঘরে বসে কি করে বাকি জীবনটা কাটবে তাই চিন্তা করছিল। রাত তখন বারোটা।

বিনিদ্র রজনী যাপন করছিল সীতা। ভাবছিল অনেক কথা। একে একে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো ভেসে এসে দোলা দিচ্ছিল তার মনে।

বিকাশের সাথে তার নিবিড়তা যেদিন অবিনাশবাবু জানতে পারেন, সেদিন থেকেই তিনি তাকে ভাল চোখে দেখেননি। তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন সীতাকে। মাঝে মাঝে তিনিই সীতাকে বিকাশের সাথে আকারে-ইঙ্গিতে মেলামেশা করতে বারণ করতেন।

কিন্তু কেন ?

কে দেবে সীতার এ প্রশ্নের উত্তর ?

একদিন অবিনাশবাবুর কাছ থেকে কথায় কথায় অন্য ভাবও প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি সীতাকে কাছে পেতে চান।

কিন্তু তিনি মৃতদার। বয়স্ক। তাঁর সঙ্গে যে সীতার মিলন একেবারেই অসম্ভব। লোকটা কি পাগল না স্বার্থের নেশায় অচেতন ?

সীতার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটলো। বাইরে কার যেন অস্পষ্ট পদশব্দ শোনা গেল।

এত রাতে কে আবার পায়চারি করছে এখানে ? সীতা বিরক্ত হল। বোধহয় কারও ঘুম ভেঙেছে।

দরজা খুলল সীতা। বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করবে। বাইরে বেরিয়ে এল সে ঘর ছেড়ে।

অস্পষ্ট শব্দ ক্রমশ স্পষ্টতর হতে লাগল। কে যেন পেছনে। মুখ ঘোরাল সীতা। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার মুখের ওপর একটা ভেজানো রুমাল চেপে ধরল।

অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধের আমেজ···অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়ল সীতার দেহ। সামান্যতম বাধা দেবার সুযোগও পেল না সে।

সীতার অসাড় দেহটা বহন করে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হল আগন্তুক।

পরদিন ধীরে ধীরে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে সীতা। মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করছে তার। সারা শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত। যেন এক যুগ পরে ঘুম ভেঙেছে তার।

সহসা উঠে বসল সীতা। শক্ত মেঝের ওপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে। ঘরটা নিস্তব্ধ, আঁধারে আচ্ছন্ন। একটা ভ্যাপসা গন্ধ যেন ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। চারদিকে ভাল করে চাইলো সীতা।

ওপরের ঘুলঘুলিটা দিয়ে একটুখানি আলো আসছে যেন।

অনেক কষ্টে দেয়াল বেয়ে ঘুলঘুলির দিকে উঁকি মারল সে।

দালানের ওপারে আর একটা ঘর। সেটাও বন্ধ।

বিশ্রী অবসাদে সীতা এলিয়ে পড়ে। ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া তার দেহ থেকে তখনও দূর হয়নি।

খিদেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে।

অকস্মাৎ দরজাটা খুলে যায়।

ঘরে প্রবেশ করে একজন কুঁজোমত লোক। বিশ্রী কালো রঙ। মুখখানা ভয়াবহ। একটা চোখ কানা। পিঠের ওপর কুঁজ থাকায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেহটা। নিচের ঠোঁটটাও ঝুলে পড়েছে।

—এই যে, রাজকন্যার ঘুম ভাঙলো দেখছি!

হাতের সুদীর্ঘ ছোরাটা নাচাতে নাচাতে এগিয়ে আসে সীতার দিকে। বলে—এবার এই গরীবের কুঁড়ের সামান্য খাবারটুকু খেয়ে নাও দেখি।

অবাক হয়ে সীতা ভাবতে থাকে—এ সে কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছে?

খাবারের থালাটি রেখে লোকটি বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—এখন আর অভিনয় করে কি হবে? খেয়ে নাও। ওবেলা রাজপুত্র আসবেন। তাঁর সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হবে আজ।

বিয়ে। তার মানে? চমকে ওঠে সীতা। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

বিশ্রী হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তোলে লোকটা। তারপর বেরিয়ে যায়। আবার বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সীতা। আর কোনদিন মুক্তি পেয়ে সেখান থেকে ফিরতে পারবে কি না কে জানে।

॥ তেরো ॥

খুব সকালে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী কয়েকটি জরুরী কাজ সেরে নিল। তারপর সহকারী রতনলালের দিকে চেয়ে বললে—তোকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে রতন।

—কি কাজ? রতন প্রশ্ন করল।

—প্রথমত সবিতা নামে একটি মেয়ের ঠিকানা দিচ্ছি। বলাইবাবুর মেয়ে। আজ সারাদিন তাকে ফলো করতে হবে, যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। আমার আবার একদিকে অন্য কাজ আছে। যদি কোন মূল্যবান সূত্রের সন্ধান পান সঙ্গে সঙ্গে থানায় ইন্‌স্পেক্টর তরফদারকে জানাবি।

—আচ্ছা।

রতন বেরিয়ে যায়।

অতঃপর দীপক চিন্তা করতে থাকে কোথায় যাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে এলো সীতার নিখোঁজ হবার টেলিফোন।

দীপক রিসিভারটা তুলে নেয়।

অপর প্রান্ত থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে আসে—

—হ্যালো, দীপকবাবু?

—হ্যাঁ কথা বলছি! আপনি কে বলছেন?

—আমি মিস্ট্রি গার্ল বলছি। সীতাদেবীকে গুম করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কিছু করণীয় থাকলে করুন। বেশী দেরি করলে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

দীপক কিছু বলার আগেই ক্লিক করে শব্দ হল। ওপাশ থেকে লাইন কেটে দিয়েছে।

রিসিভার রেখে দিয়ে দীপক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

সীতাদেবীর বাবা সুনীলবাবুর কাছে পৌঁছাতে তার আধঘন্টার বেশী সময় লাগল না।

একটা বিরাট বাড়ির একটি মাত্র অংশ ভাড়া নিয়ে থাকেন তিনি।

দীপক গিয়ে তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করতেই একজন প্রৌঢ়মত ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন পাশের ফ্ল্যাট থেকে।

দীপক প্রশ্ন করে—সীতাদেবী কি এখানে থাকেন?

লোকটি বললে—কে? ওই বাড়ির মেয়েটা? যে মেমসাহেব সেজে রোজ অফিসে যায়? কাল থেকে ত সে নিখোঁজ।

দীপক জোর দিয়ে বললে—তাঁর বাবা এখানে থাকেন ত?

লোকটি মাথা চুলকে বললে—ওপরের ফ্ল্যাটে যান মশাই, যত সব ফিরিঙ্গি মেয়েদের কারবার! ফ্যাসানের উপদ্রব দেখে আর বাঁচি না বাপু!

দীপক কোন কথা না বলে সোজা দোতলায় গিয়ে কড়া নাড়ে।

সুনীলবাবু দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বললেন—কাকে চাই?

দীপক বললে—সুনীলবাবুকে।

—আমিই। বলুন কি চাই ?

—আমি দীপক চ্যাটার্জী—কয়েকটা জরুরী ব্যাপারে আপনার বাড়ি একবার সার্চ করতে চাই।

সুনীলবাবু বললেন—বেশ আসুন। এতে আর আমার আপত্তি কি ?

সারা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল।

কোণের ঘরটি সীতার শোবার ঘর।

খাট, আলনা, চেয়ার, টেবিল, আলমারি···

আলমারির নিচের থাকে বই-এর মধ্যে দীপক দেখতে পেল একখানা ছবি। একটা পুরুষের সাথে সীতা দাঁড়িয়ে। পুরুষটি অন্য কেউ নন, বিকাশের কাকা অবিনাশবাবু।

—একে আপনি চেনেন ? দীপক প্রশ্ন করে।

—না। সীতার বাবা সুনীলবাবু বললেন।

—সে কি ! এ ছবি কি আপনি আগে দেখেননি ?

—দেখেছি।

—এ সম্বন্ধে সীতাদেবীকে কোন প্রশ্ন করেননি ?

—করেছিলাম।

—কি উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ?

—বলেছিল, যে-অফিসে চাকরি করে সেই অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দীপক আর কথা বাড়ায় না। অন্য জিনিসপত্র খানিকটা নাড়াচাড়া করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

* * *

দীপকের গাড়ি এসে তারপর থামলো অবিনাশবাবুর অফিসের সামনে।

দীপক দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় তাঁর চেম্বারের দিকে।

তিনি কি একটা যেন লিখছিলেন তাঁর চেম্বারে—দীপককে দেখে তা চাপা দিলেন। বললেন—হঠাৎ গরীবের কুটিরে ?

দীপক সে-কথার উত্তর না দিয়ে ফটোটা তাঁর সামনে ফেলে দিয়ে বললে—চিনতে পারেন এই মেয়েটাকে ?

—হ্যাঁ, আমার অফিসে চাকরি করে।

—কাল থেকে তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

—সে কি!

—ঠিকই বলছি।

—সে কোথায় গেল ?

—সে প্রশ্নই ত করতে চাই আপনাকে।

—তার মানে ? আপনি কি বলতে চান যে আমিই তাকে আমার কোটের পকেটে লুকিয়ে রেখেছি ?

—তা নয়। কিন্তু আপনি এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত ছিলেন।

—কি বলতে চান আপনি ?

—আর কিছুই বলছি না। যা বলেছি, উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে বলিনি। আধঘণ্টা সময় দিলাম আপনাকে। এর মধ্যে যদি সীতা দেবী কোথায় আছে সে খবর না জানান, তবে আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হবো।

—আপনি কি পাগল হলেন ? সীতা কোথায় তা আমি—

—হ্যাঁ। আমি কথা শেষ করেছি।

—হোয়াট ডু ইউ মীন ?

—আই মীন হোয়াট আই সে। জেনে রাখুন, দীপক চ্যাটার্জী যা বলে, তা প্রমাণ না রেখে বলে না।

অবিনাশবাবুর মুখটা যেন হঠাৎ ফ্যাকাসে আকার ধারণ করে!

॥ চৌদ্দ ॥

বাড়িতে ফিরে এসে দীপক স্নান আহার শেষ করে পরবর্তী কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করছিল, এমন সময় পেলে হঠাৎ একটা চিঠি—সে দিনের ডাকে সেটা এসেছে।

দীপক চিঠিটা খুলে পড়ল। তাতে লেখা :

তোমার বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্ত চলেছে। যে-কোনও মুহূর্তে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। খুব সাবধান! ইতি—

মিস্‌ট্রি গার্ল।

দীপক ভাবতে থাকে।

আর যাই হোক, মিস্‌ট্রি গার্ল তার হিতৈষিণী।

চিঠির কাগজ, হাতের লেখা, সব কিছু ঠিক আগের মতোই। কোন পার্থক্য নেই কোথাও। সব কটি মিস্‌ট্রি গার্লের চিঠি একই লোকের লেখা। কিন্তু তাকে ভয় দেখিয়ে যে অন্য দুটি চিঠি দেওয়া হয়েছে সে দুটি অন্য হাতের লেখা।

চিঠিটা পেয়ে মিনিট দুয়েক চিন্তা করে দীপক, তারপর ভাবে যে ডাঃ সেনের ওখানে একবার ঘুরে এলে হয়। তাঁর সাথে এ খুনের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা দরকার।

দীপক গাড়িতে উঠে বসে।

* * *

পার্ক সার্কাস। ডাঃ সেনের ডিস্‌পেন্‌সারি।

গাড়ি থেকে নেমে দীপক লিফ্‌ট-এ দোতলায় উঠে যায়।

চেম্বারে বসে গোটা কয়েক রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ডাঃ সেন।

—কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী? দীপককে দেখে প্রশ্ন করেন ডাঃ সেন।

—বিশেষ কিছু নয়—কয়েকটা কথা ছিল।

—বলুন ?

—বিশেষ অনুসন্ধান করলাম মৃত বিকাশের সম্বন্ধে। এর সঙ্গে আবার বলাইয়ের মৃত্যুও এসে জড়িয়েছে। যাই হোক, মোটামুটি যাদের ওপর সন্দেহ হয় তারা কিন্তু বর্মা থেকে কিংবা ঐ রকম বিদেশ থেকে বিষাক্ত গাছের রস সংগ্রহ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ডাঃ সেন বললেন—সব কিছুই একটা লোকের কাজ বলে মনে করছেন কেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—তার মানে ?

—কয়েকজনের মিলিত ষড়যন্ত্রও ত হতে পারে।

—কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব ?

দীপকের চিন্তার ভাব লক্ষ্য করে ডাঃ সেন বলেন—এটার রহস্য জটিল হতে পারে, কিন্তু পথ সহজ।

দীপক কেমন যেন চিন্তামগ্ন। কোথায় এর মূল ? কে সে ? মিস্‌ট্রি গার্ল—অবিনাশবাবু—সীতা—জটিল রহস্যের এক একটি গ্রন্থি।

ডাঃ সেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীর পায়ে নিচে নামতে থাকে দীপক।

নিচে নেমে এসে গাড়িতে চড়ে বসে দীপক। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে গাড়ির গদিতে পিন দিয়ে আটকান একটা চিঠির উপর। তাতে লেখা :

প্রিয় মিঃ চ্যাটার্জী,

এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যান। নতুন সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে সেখানে। কিন্তু খুব সাবধান। শত্রু বড় ভয়ানক। ইতি—

মিস্‌ট্রি গার্ল।

দীপক বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দেয় দ্রুত গতিতে।

মিনিট পনের পরে বাড়িতে ফিরে ড্রইংরুমে চুপচাপ বসে থাকে দীপক। পরবর্তী কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকে।

কেন মিস্ট্রি গার্ল তাকে চিঠি লিখল? বার-বার তাকে সাবধানই বা কেন করছে? চিন্তার ঘূর্ণিপাকে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

টেলিফোন বেজে ওঠে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে?

—আমি রতনলাল কথা বলছি।

—কি খবর?

—জরুরী খবর আছে। কথাগুলো শোন্।

—কোত্থেকে বলছিস তুই?

—পাবলিক টেলিফোন থেকে। শত্রুর লোক বোধহয় ফলো করেছে আমাকে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সাবতার পেছনে ব্যস্ত ছিলাম। ৪২০ নম্বর আনোয়ার শা রোডে সোজা চলে আসবি। ছোট্ট চায়ের দোকান।

—কেন?

—খবর পাওয়া গেছে।

—পুলিস নিয়ে আসব নাকি?

—না, একা।

—এক্ষুণি?

—হ্যাঁ।

রিসিভার নামিয়ে রাখে দীপক। সত্যিই ত মিস্ট্রি গার্ল তাকে বাড়িতে আসতে বলে সাহায্য করেছে যথেষ্ট।

কিন্তু এক্ষুণি সেখানে যাওয়া কি উচিত হবে?

দীপক চিন্তা করছিল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে চিন্তাসূত্র কেটে গেল তার।

ঝুম্! ঝুম্! ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ···

হাতবোমার প্রচণ্ড শব্দ ও জানলার শার্শি ভাঙ্গার শব্দ।

দীপক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। দাঁড়িয়ে লনের দিকে রিভলভারটা তুলে দুবার ফাঁকা আওয়াজ করে সে। কোনও প্রত্যুত্তর নেই।

আশ্চর্য! তার জীবনকে ধ্বংস করবার জন্য এভাবে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে কেন? তবে কি সে ঠিক পথে এগোচ্ছে?

একজন লোক দ্রুতবেগে পালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। হাঁক দেয়—কে?

লোকটা ছুটে পথটা পার হয়ে রাস্তায় পড়ে। রাস্তার ওপর অপেক্ষা করছিল একটা মোটরগাড়ি, চড়ে বসে তাতে।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল বড় রাস্তা ধরে।

* * *

আধঘণ্টা বাদে। একজন কাবুলিওয়ালা এসে রতনের পাশে দাঁড়াল।

—কেয়া চাহিয়ে? সজোরে বলল রতন।

— কি রে, চিনতে পারছিস না?

একি, এ যে দীপকের কণ্ঠস্বর।

—আশ্চর্য মেককাপ নিয়েছিস ত তুই?

—যাক, সবিতা কোথায়?

—ওই রেস্তোরাঁয়। ওই যে বেরিয়ে এলো। সঙ্গের লোকটিকে কিন্তু চিনি না।

—আচ্ছা তুই বাড়ি যা। আমি দেখছি। এ বোধহয় দলের নব নিযুক্ত কেউ হবে।

কাবুলিওয়ালাবেশী দীপক গাড়িতে উঠে বসে। রতন অন্যদিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করে।

॥ পনেরো ॥

তখন বেলা বারোটা।

সবিতা তার বাড়িতে সেই যে প্রবেশ করল, তারপর আর বাইরে বের হবার নামগন্ধও নেই।

দীপক বহুক্ষণ অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

দুপুর পেরিয়ে গেল।

বিকেলের ছায়া নামল পৃথিবীর বুকে। অবশেষে সন্ধ্যার আঁধার নামল।

দীপক একফাঁকে পাশের রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া শেষ করেছে। কিন্তু তবুও এতখানি পরিশ্রম তাকে বিরক্ত করে তুলছিল। মিস্ট্রি গার্লের ইঙ্গিত না পেলে সে এদিকে আসত না।

হঠাৎ দীপকের নজর পড়লো, সবিতা বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। যেন কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

দীপক তখন রেস্টুরেন্টের পাশের পান-দোকানীর সাথে হিন্দি ভাষায় গল্প জমিয়েছিল।

সবিতা তার দিকে তাকাল না। খট্-খট্ শব্দে খুরওয়ালা জুতো পিচ ঢালা রাস্তার ওপর ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। তারপর একটা ট্যাক্সিতে বসে কি যেন হুকুম দিল।

চঞ্চল হয়ে উঠল দীপক।

চেটার ওপর খানিকটা খৈনী নিয়ে টিপতে টিপতে এগিয়ে গেল সে বড়

রাস্তার দিকে। সেখানে গিয়ে নিজের গাড়িতে চড়ে বসল। তার গাড়ি দূরের ট্যাক্সিখানাকে অনুসরণ করে চলল।

* * *

শহরতলীর প্রান্তে ছোট্ট একটা বাড়ি।

দীপক গাড়ি থামাল। অন্য একটা রাস্তা দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে ওখানে রেখে ফিরে এল পূর্বোক্ত বাড়িখানার সামনে।

সবিতা কড়া নাড়ে।

দরজা খুলে যায়। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গৌর। দীপক অবাক,—ধীরেনবাবুর মামাতো ভাই এখানে কেন? আশ্চর্য ত!

গৌরকে দেখেই সবিতা এগিয়ে গেল ওর দিকে। হাত ধরল তার। সেক-হ্যাণ্ড করল গৌর। আশ্চর্য! বাঙালী মেয়ে—সেক-হ্যাণ্ড! তারপর ভাবল, আশ্চর্য নয়। গৌর দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে ভালবাসে বলেই শুনেছে।

দুজনে অদৃশ্য হল ভেতরে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

দীপক চিন্তিত।

ঘটনাগুলো এমন বিচ্ছিন্ন যে একসূত্রে গাঁথা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু যোগাযোগ এদের মধ্যে আছেই অলক্ষ্যে। কিভাবে এই জটিলতার সমুদ্র পার হবে দীপক?

এক কাজ করলে হয় না? দীপক ভাবল, বাড়িখানার ভেতরে যদি সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করা যায় কেমন হয়?

যা ভাবা, তাই কাজ। দীপকের কাছে বাধা বলে কোনও বস্তু নেই।

দীপক জামা-কাপড় ঠিক করে নেয়।

পুরানো বাড়ি। সামনের দিক দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। দীপক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

গ্যাসপোস্ট বেয়ে উঠে, পেয়ে গেল ছাদের কার্নিশ।

সামনের ছোট ঘরটায় প্রবেশ করল দীপক। ঘরখানি সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। জন-মানবের সাড়া মাত্র নেই সেখানে।

দীপক এগোলো পায়ে পায়ে। পাশের ঘর পেরিয়ে বারান্দা। তার-পর নিচে নামবার সিঁড়ি।

কিন্তু কোথায় গৌর? কোথায় সবিতা? সব কি উড়ে গেল নাকি?

চিন্তার মোড় ফেরাল দীপক।

নিশ্চয়ই নিচে নামবার সিঁড়ি আছে। পুরানো বাড়ি, মাটির তলায় ঘর থাকতে পারে। কিন্তু কোন পথে নামা যায়?

দীপক ভাবছিল কি করা যায়।

হঠাৎ পেছনে অট্টহাসি!

—গোয়েন্দাগিরিরও একটা সীমা থাকা উচিত। অনেকবার সাবধান করেছি তোমাকে। শয়তান টিকটিকি! মাথার ওপর হাত তোল!

পেছনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক।

একজন দীপকের পরিচিত—অবিনাশবাবু। অন্যজন হল—গৌর, দীপক কিছুক্ষণ আগে তাকে দেখেছে সবিতার সঙ্গে।

সামান্য মাত্র বাধা দেবার আগেই শত্রুর হাতে বন্দী হল দীপক।

* * *

এদিকে মিঃ তরফদার লালবাজারে বসে একটা চিঠি পেলেন।

আপনি যদি দীপকবাবু ও সীতা দেবীকে বাঁচাতে চান তাহলে অবিলম্বে···নং বাড়িতে হানা দিন সশস্ত্র পুলিসবাহিনীসহ। ইতি—

মিস্ট্রি গার্ল।

তক্ষুণি তিনি রওনা হলেন সদলে শহরতলী অঞ্চলের নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে। পুলিস দল সশস্ত্র।

নির্দিষ্ট বাড়িতে ধরা পড়ল বিকাশের হত্যাকারী। তিনি আর কেউ নন—ধীরেনবাবু।

দীপক ও সীতা মুক্তি পেল।

দীপক বললে—অবিনাশবাবুর অবশ্য প্রচুর দোষ ছিল। তিনি সীতাকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন।

মিঃ তরফদার বললেন—কিন্তু সামুইফুলের বিষ?

আর একজন লোকের দিকে পিস্তল উদ্যত করে দীপক বললে—সে হলো এই গৌর। ধীরেনবাবু এর কাছ থেকেই সেটা সংগ্রহ করেছিলেন। দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করা গৌরের নেশা। বর্মা থেকে ওটা সংগ্রহ করেছিল।

সকলের হাতেই হাতকড়া পরানো হলো।

এমন সময় একটি নারী-মূর্তি প্রবেশ করল। সারা দেহ তার কালো পোশাকে আবৃত। তার দুহাতে দুটি উদ্যত পিস্তল। দুজনের বুকের দিকে তা নিবদ্ধ। দুজনেই পিছু হটতে হটতে বাড়িতে ঢুকল। এই দুজনের একজন হলো অবিনাশবাবু—অন্যজন সবিতা।

মেয়েটি বললে—এই যে দেখছেন সবিতা, এ হচ্ছে এদের সকলের পরিচালিকা।

ধীরেন অর্ধেক সম্পত্তি পাওয়ার লোভে একাজ করেছে। আর তাকে সাহায্য করে ইন্ধন জুগিয়েছে এই অবিনাশবাবু। এরা বহু লোককে সর্বস্বান্ত করেছে।

অবিনাশবাবু ও সবিতাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

তারপর দীপক বলল—তুমিই ত সেই মিস্‌ট্রি গার্ল?

—হ্যাঁ। বলেই সে কি একটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিল।

সারা ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

ধোঁয়া সরলে দেখা গেল, মিস্‌ট্রি গার্ল অদৃশ্য হয়েছে।

মিঃ তরফদার বললেন—কে এই নির্ভীক নারী?

দীপক হেসে বললে—ইনি শেঠ রামরতনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—

অন্যায়কে ইনি ঘৃণা করেন। তবে এইভাবে উপার্জিত টাকা নিয়ে সৎকাজে ব্যয় করেন।

—আশ্চর্য মেয়ে ত!

নিঃশ্বাস ফেললেন মিঃ তরফদার।

দীপক বললে—ষড়যন্ত্রকারীরা এমনভাবে চক্রজাল বিস্তার করেছিল যে, কোনমতেই তা কল্পনায় আনা যায় না। মিস্‌ট্রি গার্লের আবির্ভাব না ঘটলে এই জটিল গ্রন্থি শিথিল হতো কি-না সন্দেহ।

মিঃ তরফদার কোন কথা বললেন না। তিনি নির্বাক।

একটু থেমে তিনি বললেন—একটা কথা,—মিস্‌ট্রি গার্ল যে প্রকৃতপক্ষে কে, তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন আগে?

দীপক হেসে বললে—হ্যাঁ, তা পেরেছিলাম।

—কি করে?

—শেঠ রামরতনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আধুনিকা এবং তিনি স্বামীর অসুখের সময় পর্যন্তও তাঁর পাশে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই তাঁকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু এত করেও শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধরা গেল না, এই দুঃখ থাকল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ তরফদার—কোনও কথা বলতে পারলেন না তিনি।

॥ শেষ ॥